সবাই যা দেখে

# ‘বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষা চার বছর পিছিয়ে’- ভয় পাওয়ার কিছু নেই

আবদুল মান্নান খান

| ঢাকা , মঙ্গলবার, ১২ মার্চ ২০১৯

২৮-০২-২০১৯ তারিখের কয়েকটি কাগজে দেখলাম বিশ্বব্যাংক এক প্রতিবেদনে বলেছে মানের দিক দিয়ে বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষা চার বছর পিছিয়ে আছে। এর মানে আমাদের শিশুরা প্রথম শ্রেণীতে যা শেখার কথা তা শিখছে পঞ্চম শ্রেণীতে গিয়ে। ১১ বছরের স্কুলজীবনে ৪ বছরই নষ্ট হয়ে যাচ্ছে তাদের । তবে শতকরা কত জন শিক্ষার্থীর এ অবস্থা, বিশ্বব্যাংক তা বলেনি। সেটা বলা থাকলে এনিয়ে কিছু বলতে সুবিধা হতো। একবার এ কলামে সরকারি স্কুলের তৃতীয় শ্রেণীর ইংরেজি বিষয়ের একসেট প্রশ্নপত্র তুলে ধরে বলেছিলাম, তৃতীয় শ্রেণীর ৮-৯ বছর বয়সের একটা শিশুর পক্ষে ইংরেজির এ সুদীর্ঘ প্রশ্নপত্র পড়ে-বুঝে দুই ঘণ্টায় উত্তর করা কীভাবে সম্ভব! আর যদি সম্ভব হয়ও তাহলে সেটা কত পার্সেন্ট শিক্ষার্থীর পক্ষে সম্ভব। এমন লেখাপড়া করার মতো সুযোগ-সুবিধাই বা আমাদের কতজন ছেলেমেয়ে পেয়ে থাকে’। কথাটা এখানেও

প্রাসাঙ্গিক মনে কার। কারণ আমাদের রয়েছে অনেক রকম শিক্ষা ব্যবস্থা যেমন কোন শিশু পড়ছে ইংরেজি মিডিয়ামে কোন শিশু পড়ছে ইংরেজি ভার্সানে কোন শিশু পড়ছে সরকারি স্কুলে কেউ পড়ছে এবতেদায়ি মাদরাসায় আবার কেউ পড়ছে হাফেজি-নূরানি বা কওমি মাদরাসায়। জগাখিচুড়ি মার্কা হলেও রয়েছে ব্যাপক আকারে কিন্ডারগার্টেন নামের স্কুলÑশহর থেকে গ্রাম পর্যন্ত। ফলে শিক্ষার মধ্যে যেমন তারতম্য রয়েছে তেমন মানের মধ্যেও তারতম্য রয়েছে ব্যাপক। তবে সব মিলিয়ে আমাদের প্রায় সব শিশু এখন স্কুলে যাচ্ছে এটাই আমাদের বড় ধরনের অর্জন একথা ভুলে গেলে চলবে না। এক সময় তো আমরা ভাবতেই পারিনি আমাদের সব শিশু একদিন স্কুলে যাবে। এটা সম্ভব হয়েছে সরকারের বেশ কিছু ভালো পদক্ষেপ গ্রহণের কারণে। যেমন ১. বিনামূল্যে বই : সবাইকে দেয়ার প্রয়োজন না থাকলেও সবাইকে বিনামূল্যে পাঠ্যবই দেয়া হচ্ছে। এর ভালো দিকটা হলো সবাইকে না দিলে বই নিয়ে বাণিজ্যে মেতে উঠবে, বাজারে বইয়ের সংকট সৃষ্টি করবে যেমন করেছে নোট-গাইড-কোচিং নিয়ে একটা গোষ্ঠী। হাজার হাজার কোটি টাকা ব্যয়ে বিনামূল্যে দেয়া বই পাশে রেখে তারা বলা যায় সব শিক্ষার্থীর হাতে এখন গাইড বই তুলে দিতে সক্ষম হয়েছে তারা। এখন এমনও দেখা যাচ্ছে বিষয় ভিত্তিক গাইড বই যেটা দেখলে মনে হবে বড় আকারের একটা খাতা। ওপরে কিছু লেখা নেইÑ মলাটটা পুরুÑ যাহোক সে ভিন্ন প্রসঙ্গ। ২. উপবৃত্তি : গরিব

জনগোষ্ঠীর ছেলেমেয়েদের উপবৃত্তির টাকা প্রদান করা হয়। সরকারি স্কুলে পড়তে কোন টাকাপয়সা লাগে না বরং পাওয়া যায় একথা এখন ওই শ্রেণীর সবাই জানে। এবং ওই টাকা দেয়া নিয়ে নয়ছয় করার কোন সুযোগ নেই। সরাসরি অভিভাবকের হিসাবে চলে যাচ্ছে টাকা। এ উপবৃত্তির টাকা দেয়া নিয়ে আমার একটা ছোট্ট অভিজ্ঞতার কথা বলি। উপবৃত্তির টাকার সুষ্ঠু বণ্টন নিয়ে কথা উঠেছে। অভিযোগ নানা রকম। এ অবস্থায় প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতর থেকে কর্মকর্তাদের বিভিন্ন এলাকায় পাঠানো হলো সরেজমিন দেখে আসার জন্য। ধরিয়ে দেয়া হলো একটা ছক। স্কুলে বসে পূরণ করে আনতে হবে। আমাকে পাঠানো হলো কিশোরগঞ্জ জেলার একটি উপজেলার চারটি বিদ্যালয়ের তথ্য সংগ্রহ করার জন্য। একটি স্কুলে দ্বিতীয় শ্রেণীর একটি সেকশনে ঢুকে জানতে চাইলাম, মেয়েরা কারা উপবৃত্তির টাকা পাও উঠে দাঁড়াও। দেখা গেল আরও মেয়েদের সঙ্গে দুটো মেয়ে পাশাপাশি বসা থেকে উঠে দাঁড়িয়েছে। এর মধ্যে লক্ষ্য করলাম একটি মেয়ে আরেকটি মেয়েকে ঘাড়ে হাত দিয়ে বারবার বসিয়ে দিতে চাচ্ছে। কিন্তু মেয়েটি বসছে না। কেন ওকে বসিয়ে দিতে চাচ্ছে জানতে চাইলে সে বলল, ’ও বৃত্তির টাকা পায় না’। তুমি বৃত্তির টাকা পাও না তাহলে দাঁড়িয়েছ কেনÑ জানতে চাইলে সে বলল, ‘আমি টাকা পাতাম। ফেল করিচি বলে এখন পাইনে’। মেয়েটির এ কথায় আমি শুধু তার কচি শুকনো মুখখানার দিকে চেয়ে রইলাম কিছুক্ষণ। ভাবলাম হায়রে

কপাল! হতদারিদ্র সহায়-সম্বলহীন শিশুকে স্কুলে আসার জন্য, স্কুলে তাকে ধরে রাখার জন্য যে চেষ্টা এ তার পরিণতি। সে যদি স্কুলে আসে-যায় কিছু না হলেও দুটো একটা ছড়া তো শিখবে। স্বপ্ন দেখা শিখবে। যা হবে আমাদের ভবিষ্যতের জন্য অর্জন। এছাড়া তার ছোট্ট শিশুমনে কষ্ট সৃষ্টি করার তো কোন অধিকার আমাদের নেই। ওই শিশুর সঙ্গে একান্তে কথা বলে আমি জেনেছিলাম তার বাপ নেই। মা পাগল প্রায়। সংসারে দুটো পয়সা আসার মতো কোন পথ ওদের নেই- তারপরও স্কুলে আসছে। এর পরে শিক্ষক সাহেবরা বললেন, নীতিমালার বাইরে তো আমরা যেতে পারি না। যা আদেশ হয়েছে আমরা তাই করেছি। আদেশ হয়েছে যারা পরীক্ষায় গড়ে ৪০% নম্বর পাবে না তারা উপবৃত্তির সুবিধা পাবে না। এ আদেশ আসার পরে তাই অনেকে বাদ পড়েছে। যাহোক, সে হবে প্রায় ১৫-১৬ বছর আগের কথা, সর্বশেষ খবর না জানলেও বলতে পারি এখন আর ওসব নেই একটা ফরমে দাঁড়িয়ে গেছে। ৩. স্কুল ফিডিং প্রোগ্রাম : সব শিশু স্কুলমুখী করার আরেকটা প্রশংসনীয় প্রোগ্রাম হলো ‘স্কুল ফিডিং প্রোগ্রাম’। বাচ্চারা স্কুলে কিছু খাবার পাবে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ছেলেমেয়েদের স্কুলের দিকে আকৃষ্ট করতে এ একটা চমৎকার ব্যবস্থা। আমরা আশা করতে পারি সীমিত এলাকা ছেড়ে দেশব্যাপী এর বিস্তার ঘটবে। কারণ এর সুফল একেবারে হাতেনাতে।

এই যে পিছিয়ে থাকা বিশাল একটা জনগোষ্ঠীর ছেলেমেয়েদের স্কুলমুখী করা গেছে শুধু না

তাদের স্কুলে ধরে রাখারও চেষ্টা অব্যাহত রয়েছেÑ একথাটা মানের হিসাব করতে সবার মনে রাখতে হবে। ঢালাও ভাবে কিছু বলে যাওয়া বোধ হয় সঠিক হবে না। বলতে চাচ্ছি বিশ্বব্যাংকেরও একথাটা বুঝতে হবে। হত দরিদ্র, দরিদ্র বা প্রান্তিক যায়-ই বলা হোক না কেন আমি ধারণা করি এ জনগোষ্ঠীর সন্তানদের সংখ্যা মোট এনরোলমেন্টের ৪০ ভাগ হবে। বলতে পারছি না পরিসংখ্যানে কী আছে। আর জ্ঞানের কথা! আমাদের শিশুদের জ্ঞান কম নেই। গ্রামে যান, জিজ্ঞেস করেন একটা পাঁচ-সাত বছরের শিশুকে তার পরিবেশ সম্পর্কে। যেখানে সে বসবাস করে, যা দেখে তার সম্পর্কে সে কতটুকু জ্ঞান রাখে। সূর্য যখন মাথার উপর তখন দুপুর- একথা সে জানে কিনা দেখেন। মুরগি রোজ ক'টা ডিম পাড়ে তা সে বলতে পারে কিনা দেখেন। জ্ঞানের মাপকাঠি কী? সে হয়তো তার বই থেকে মিনিটে আন্তর্জাতিক মানের নিরিখে ৩০-৪০টা শব্দ পড়তে পারছে না প্রথম-দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়ে। এর জন্য সে একটা জার্মান শিশুর জ্ঞানের কাছে কিছুই নাÑ একথা বলা যায় না। কিন্তু বিশ্বব্যাংকের বাংলাদেশ কান্ট্রি ডিরেক্টর রবার্ট জে সাম একথা বলেছেন। তিনি বলেছেন, ভিয়েতনামের উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থী যে পরিমাণে জ্ঞান অর্জন করতে পারছে জার্মানির শিক্ষার্থীরা প্রাথমিক পর্যায়েই তা শিখছে'। অর্থাৎ বাংলাদেশের শিশুরাও ভিয়েতনামের শিশুদের মতো ওই পর্যায়ে নেমে

গেছে। একথা শুনে আমাদের হতাশ হলে চলবে না।

আমাদের প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত মানে ঘাটতি রয়েছে একথা আমরা অস্বীকার করছি না। বিশ্বব্যাংক এর প্রতিকার করতে কয়েকটি সুপারিশও রেখেছে তাও আমরা মানছি। এর কারণগুলোও তারা উল্লেখ করেছে যেমন শিক্ষার মানোন্নয়নের কর্মসূচি দুর্বল, পাঠদান নিম্নমানের, স্কুল ব্যবস্থাপনা খারাপ, সরকারি বিনিয়োগ কম ইত্যাদি। এর মধ্যে শুধু পাঠদান নিচুমানের এ সম্পর্কে কিছু কথা বলতে চাই এখানে।

একথা সবাই স্বীকার করবেন যে, মানসম্মত শিক্ষা পাওয়া না পাওয়া বহুলাংশে নির্ভর করে শিক্ষকদের ওপর এবং শ্রেণীকক্ষই শিক্ষার মূল কেন্দ্র এ সত্যটির ওপর। আর একথাও ঠিক যে এ দুটো ক্ষেত্রেই আমাদের দুর্বলতা সৃষ্টি হয়েছে। শ্রেণীকক্ষ ছেড়ে শিক্ষা হয়েছে কোচিং নির্ভর এবং শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রেও রয়েছে নানা কথা। যেমন হাজার হাজার শিক্ষকের পদ খালি পড়ে থেকেছে বছরের পর বছরÑ এক্ষতি কী দিয়ে পোষাবে। এর কারণ হতে পারে উপযুক্ত প্রার্থীর অভাব বা বাছাইয়ে গলদ। আরেকটা হতে পারে শিক্ষার মান তো দু-এক বছরেই পড়ে যায়নি। বেশ বছর আগেই তো আমরা আঁতকে উঠেছিলাম ঢাকা ইউনিভার্সিটির ভর্তি পরীক্ষায় পাসের হার শুনে। আরেকটা হতে পারে দুর্নীতিই এর প্রধান কারণ। ফলে সব মিলিয়ে পরিণতি, শিক্ষায় মানের ঘাটতি। তবে আমি মনে করি না আমাদের শিক্ষক মহোদয়রা এখানে বেশি দায়ী।

তারা বিএ- এমএ পাস করে বিরাট একটা প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে শিক্ষকতার চাকরিতে ঢুকেছেনÑ নিচ্ছেন পিটিআইসহ নানারকম ট্রেনিং। তারপরও তারা পারবেন না শিশুদের মানসম্মত শিক্ষা দিতে একথা বিশ্বাস করতে পারি না। গলদটা কোথায় বিশ্বব্যাংক দেখিয়ে দিয়েছে। যেমন একটা বলেছে ‘স্কুল ব্যবস্থাপনা খারাপ’Ñ একথার একটু গভীরে গেলে দেখা যাবে বেরিয়ে এসেছে কত চিত্র। কারিকুলাম যদি শ্রেণী উপযুক্ত হয়, সহজ সাবলীল হয় এবং শিক্ষকরা যেভাবে পড়াবেন-শেখাবেন সেভাবেই যদি প্রশ্নপত্র করেন, পরীক্ষা নেন তাহলে তো গলদ এমন ব্যাপক থাকার কথা নয়। শিক্ষকরা হাতেখড়ি থেকে শুরু করে একটা শিশু শিক্ষার্থীকে যখন পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত তুলে আনেন তখন ওই শিক্ষকদের থেকে ওই শিক্ষার্থীর মেধা সম্পর্কে আর কে ভালো জানতে পারেন! অথচ ওই প্রতিষ্ঠানের প্রধান শিক্ষকের দেয়া সনদের কোন মূল্য নেই। ওই সনদটা হাতে নিয়ে শিক্ষকের পায়ে হাত দিয়ে সালাম করে গিয়ে একজন শিক্ষার্থী হাইস্কুলে গিয়ে ভর্তি হতে পারছে না। পিইসি নামক এক অন্তসারশূন্য পরীক্ষায় কত নম্বর পেল সেটা বিষয়। পঞ্চম শ্রেণীর কথা বাদই দিলাম সেটা এক মহাযজ্ঞ। প্রথম শ্রেণী থেকে চতুর্থ শ্রেণী পর্যন্ত পড়ুয়া শিশুদের পরীক্ষার প্রশ্নপত্র স্ব স্ব স্কুলের শিক্ষকরা তৈরি করে পরীক্ষা নিতে পারেন না বা নিচ্ছেন না। এসব মিলিয়ে বহুত কাহিনী আছে সেদিকে আর যাচ্ছি না। তবে আমাদের এই প্রাথমিক

পর্যায়ের শিক্ষক মহোদয়রা কারও কথায় কান না দিয়ে যে কাজটা করতে পারেন তা হলো, যে শিশুটি ভালো করতে পারছে না তাকে আরেক বছর ওই শ্রেণীতে রেখে যত্নসহকারে কিছু শিখিয়ে পরের শ্রেণীতে পাঠাতে পারেন। আমি মনে করি এ ক্ষমতা তাদের আছে। এতে বরং বদনাম দূর হবে ওরাও কিছু শিখবে। আগেই বলেছি স্কুল ব্যবস্থাপনা খারাপ একথার একটু গভীরে গেলে দেখা যাবে কত চিত্র। সবাইকে চোখ বন্ধ করে পরের ক্লাসে পাঠানো সেই চিত্রগুলোর মধ্যে একটা। আমি মনে করি কোন অভিভাবক চান না মোটামুটি মানসম্মত কিছু না শিখে তার সন্তান ক্লাস পাড়ি দিক। আরেকটা হলো যারই আর্থিক অবস্থা একটু ভালো সে আর তার সন্তানকে সরকারি প্রাইমারি স্কুলে দিতে চান না, কেন চান না- এরকম রয়েছে আরও কত কাহিনী।

আবার প্রাক প্রাথমিক শিক্ষা চালু করা হয়েছে সরকারি স্কুলে যেখানে শিক্ষক ওই তারাই। প্রাক প্রাথমিক শিক্ষা একটা ভালো ব্যবস্থা। আমি বেশি দেশের কথা জানি না। যা জেনেছি তার মধ্যে চীনে দেখেছি কিন্ডারগার্টেন আছে। তিন থেকে পাঁচ বছর বয়সের শিশুরা সেখানে পড়ে যার কোন কারিকুলাম নেই। সেখানে শিশুরা নাচ-গান গল্প বলা ছবি আঁকা এসব শেখে। এপর্যায়ের শিক্ষাটা তারা সম্পূর্ণ বেসরকারি পর্যায়ে ছেড়ে দিয়েছে যদিও প্রথম শ্রেণী থেকে নবম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষা সব শিশুর জন্য বাধ্যতামূলক এবং সম্পূর্ণ সরকারের আওতায় রেখেছে।

কিন্ডারগার্টেনে পড়ে আসতে হবে এমন কোন বাধ্যবাধকতা নেই। সেখানে না পড়েও বা বছর খানেক পড়েও একটা শিশু যথাসময়ে গিয়ে প্রথম শ্রেণীতে/গ্রেডে ভর্তি হতে পারে।

শেষ করতে চাই একটা কথা বলে যে, নানা সংস্থার নানা ফরমায়েশ মতো আমাদের শিশুদের ওপর কারিকুলাম বহির্ভূত চাপ সৃষ্টি করে শিক্ষার মান বাড়ানো কঠিন হবে। নির্ভর করতে হবে শিক্ষকদের ওপর। আন্তরিক হতে হবে শিক্ষকদের ওপর। শিক্ষকদের আন্তরিক হতে হবে শিক্ষার্থীদের ওপর। বিশ্বব্যাংকের ওই কথাই হতাশ বা বিচলিত হওয়ার কোন কারণ নেই। আমাদের অর্জন অনেক আছে। প্রয়োজন যে গলদগুলো চিহ্নিত হয়েছে তা দূর করতে আন্তরিকতার সঙ্গে কাজ করে যাওয়া।